জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের

মানবাধিকারকর্মীর ব্যবহারিক পুস্তিকা

গ্রন্থনা : সাঈদ আহমদ

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের
মানবাধিকারকর্মীর ব্যবহারিক পুস্তিকা

গ্রন্থনা : সাঈদ আহমদ

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের
মানবাধিকারকর্মীর ব্যবহারিক পুস্তিকা

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১২

প্রকাশক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৭/১৭, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮০-২-৮১২৬০৪৭, ৮১২৬১৩৪, ৮১২৬১৩৭
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১২৬০৪৫
ইমেইল: ask@citechco.net
ওয়েব সাইট: www.askbd.org

© আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

প্রচ্ছদ ও অঙ্কন
জাহিদ হোসেন বেনু

ইনার পেজ ডিজাইন
তাওহীদ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট লিংক

অক্ষর বিন্যাস
মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ও রিজওয়ানুল হক, আসক

প্রুফ সংশোধন
মোহাম্মদ আলী

ISBN: 978-984-33-5133-3

মূল্য: ১৫০ টাকা

মুদ্রক: অর্ক

মুখবন্ধ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা আসকসহ বেশ কিছু সমমনা সংগঠনের আন্দোলনের ফসল। তাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করতে সম্ভাব্য সবকিছু করাকে আসক নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাদের কাজের মাধ্যমে কীভাবে রাষ্ট্র এবং অধিকারভোগী বা অধিকারবঞ্চিত মানুষের মাঝে সেতুবন্ধ তৈরি করতে পারে, তার নির্দেশনামূলক প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করেছি। এই পুস্তিকা সেই প্রয়োজন পূরণের প্রথম প্রয়াস।

এই প্রকাশনাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের বিষয়ক একটি ব্যবহারিক পুস্তিকা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যারা জানতে চান এবং যারা কমিশনে অভিযোগ দাখিল করতে চান, তারা এই প্রকাশনার মাধ্যমে উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। তাই ভাষা ব্যবহারে সহজবোধ্যতার দিকে আমরা জোর দিয়েছি। এ কাজে আমরা কতোখানি সফল, সেটি এর ব্যবহারকারীরা ভালো বলতে পারবেন। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত আমরা প্রত্যাশা করছি, যা আমাদের পরবর্তী সংস্করণের মানোন্নয়নে সাহায্য করবে।

পুস্তিকাটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেকের অবদান রয়েছে, যাদের সবার কথা হয়তো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাতে চাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানকে, যিনি এমন একটি উদ্যোগে আসককে শুধু সমর্থনই দেননি, একই সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন। এ কারণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অনেক দলিলপত্র আমরা এই পুস্তিকায় ব্যবহার করতে পেরেছি। পুস্তিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর এই সহযোগিতা আমাদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

পুস্তিকাটি লেখার দায়িত্বে ছিলেন প্রীতিভাজন মানবাধিকারকর্মী সাঈদ আহমদ। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পুস্তিকাটি লেখার দায়িত্বই শুধু নয়, তিনি এটি প্রকাশনার সার্বিক দায়িত্বও পালন করেছেন। তৃণমূল পর্যায়ের যে লোকজন এই পুস্তিকার খসড়ায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন তাদেরও জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। এছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল (ইউএনডিপি)-এর যে প্রকল্প রয়েছে, সেই প্রকল্পের অভিযোগ ও তদন্ত বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মোঃ জাহিদ হোসেন পুস্তিকাটির ওপর বিশদ মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আসক-এর সানাইয়া ফাহীম আনসারী, তৌফিক আল মান্নানসহ অন্য কর্মীরা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পুস্তিকাটির ব্যাপারে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের মতামত সংগ্রহ করেছেন। একই সাথে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ পুস্তিকাটি কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে আসক-এর শাহীন আখতার তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা পুস্তিকাটির সম্পাদনা ও পরিমার্জনায় কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়া প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ও অন্য চিত্রগুলো এঁকেছেন জাহিদ হোসেন বেনু, পৃষ্ঠাসজ্জার কাজ করেছেন তাওহীদ উদ্দিন আহমদ, অক্ষর বিন্যাস করেছেন আসক-এর মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ও রিজওয়ানুল হক, প্রুফ সংশোধন করেছেন মোহাম্মদ আলী, ছাপার কাজ করেছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'অর্ক'। তাঁদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমাদের বিশ্বাস, পুস্তিকাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ প্রেরণের ক্ষেত্রে তৃণমূল সংগঠনগুলোর জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

সুলতানা কামাল
নির্বাহী পরিচালক, আসক

ভূমিকা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। পুনর্গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যাত্রা শুরু করেছে ২০১০ সালের ২৩ জুন। সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলাকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাদের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। কমিশন এই ধারণা পোষণ করে যে, মানবসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য এবং তার জন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরে মানবাধিকার সংস্কৃতির চর্চা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, একজন নাগরিকের প্রতি অপর নাগরিকের শ্রদ্ধাবোধ সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষার মূল দায়িত্ব যেহেতু রাষ্ট্রের, তাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভুক্তভোগী নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মাঝে সেতুবন্ধের কাজ করতে চায়।

একথা ঠিক যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু নবীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিছু ক্ষেত্রে কমিশনের ঘাটতি রয়েছে। যেমন কমিশনের লোকবল ও অর্থের সঙ্কট রয়েছে, আইনে ঢাকার বাইরে এমনকি উপজেলা পর্যায়ে অফিস করার অনুমতি দেয়া থাকলেও কমিশন এই মুহূর্তে সেটা পারছে না। অন্যদিকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর মতো বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনের রয়েছে দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতা, রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তাই আসক-এর মতো বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে একসাথে কাজ করতে চায় যেন কমিশন আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তৃণমূলের মানুষ যেন সরাসরি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের ব্যবহার উপযোগী পুস্তিকা প্রকাশের এই উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আসককে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটি আসলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেরই দায়িত্ব ছিল। বন্ধু সংগঠন হিসেবে আসক আমাদের জন্য এ কাজটি করে দিচ্ছে। এই পুস্তিকা যেন আরো বেশিসংখ্যক মানুষের হাতে পৌঁছে সে ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নেব।

এই পুস্তিকার খসড়া আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছি এবং আমার মতামত দিয়েছি। এর লেখক সাঈদ আহমদ আমার বিশেষ স্নেহভাজন এবং আমার সঙ্গে যেহেতু তিনি কাজ করেছেন তাই আমি জানি, আসক লেখক হিসেবে উপযুক্ত মানুষকেই বেছে নিয়েছে। পুস্তিকাটির খসড়া নিয়ে যেহেতু তৃণমূল পর্যায়েও মতবিনিময় করা হয়েছে তাই আমি আশা করি, প্রকাশনাটি সত্যি সত্যিই তৃণমূলের মানুষের কাজে আসবে।

আসক ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে সেই প্রত্যাশা করি।

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

প্রসঙ্গ কথা

বয়সের নিরিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এখনো একটি নবীন প্রতিষ্ঠান। তবে এ অল্প সময়ে কমিশন বেশ কিছু সাফল্য দেখিয়েছে। সব থেকে বড় বিষয় হলো, সুষ্ঠু বিচার না পেয়ে এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যখন হতাশায় নিমজ্জিত, ঠিক তখন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের আন্তরিকতা ও কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ তাঁদের মাঝে পুনরায় আস্থার জন্ম দিয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আইন ও সালিশ কেন্দ্র মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ হতে সহযোগিতা করা এবং আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষা ও প্রসারে ভূমিকা রাখা। এক্ষেত্রে তৃণমূল সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আসক। অন্যদিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠায়ও আসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কমিশনের কাজকে শক্তিশালী করার জন্য আসক যেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তেমনি তৃণমূল সংগঠনের সঙ্গে কমিশনের সেতুবন্ধ তৈরিতেও উদ্যোগী হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে তৃণমূল জনগোষ্ঠী যেন সরাসরি কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে সেই লক্ষ্যে তাঁদের ব্যবহার উপযোগী একটি পুস্তিকা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসক। এক্ষেত্রে আসক সকলের মতামত-অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পুস্তিকাটি প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রথম ধাপ হিসেবে পুস্তিকাটির লেখক নির্বাচন করা হয় এমন একজনকে, মানবাধিকারকর্মী হিসেবে যাঁর দীর্ঘদিন কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গেও কাজ করেছেন। লেখক সাঈদ আহমদ প্রথমে আসক কর্মীদের সাথে আলোচনা করে এর বিষয়বস্তু ঠিক করেন। এরপর এটা নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান ও সদস্য নীরূপা দেওয়ানের উপস্থিতিতে দেশের উল্লেখযোগ্য কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। সেই আলোচনা থেকে উঠে আসা বেশকিছু পরামর্শ পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুকে আরো সমৃদ্ধ করে। এর পরের ধাপ হিসেবে পুস্তিকাটির খসড়া তৈরি হয় এবং বারোটি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ) আসক-এর সহযোগী তৃণমূল সংগঠন মানবাধিকার নারী সমাজ (এমএনএস), মানবাধিকার সংরক্ষণ পরিষদ (এমএসপি), মানবাধিকার আইনজীবী পরিষদ (এমএপি) এবং স্থানীয় শরিক সংস্থার সদস্যদের সাথে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে একটি প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে পুস্তিকাটির ভাষার সরলতা, বোধগম্যতা, ছবির সাথে ভাষার সামঞ্জস্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের মতামত নেয়া হয়। প্রাপ্ত সকল মতামতের ভিত্তিতে পুস্তিকাটির মোটামুটি একটি চূড়ান্তরূপ দাঁড় করানো হয়। সবশেষে এতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্য সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এটি চূড়ান্ত করা হয়।

আসক ইতোমধ্যে ১২টি জেলার গণসংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ১০৮ জনের একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। প্রত্যেক জেলা থেকে তিন জনকে নিয়ে ৩৬ জন ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ৩৬ জন ফোকাল পার্সনকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে, কমিশনে অভিযোগ দায়ের এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং এই পুস্তিকা হাতে-কলমে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হবে। টাস্কফোর্সের সদস্যরা নিজেদের এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে পাঠাবে। বিশেষ কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে আসক কমিশনে অভিযোগ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স সদস্যদের সহায়তা করবে।

এসব ঘটনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আসক একসাথে কাজ করবে। বৎসরান্তে পুরো কাজের পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে টাস্কফোর্সের সদস্যরা এবং প্রয়োজনে ভুক্তভোগীদের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মুখোমুখি সংলাপ আয়োজন করা হবে। এছাড়া কমিশনের অভিযোগ দায়েরের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে। এই পুস্তিকা ব্যবহারের মাধ্যমে টাস্কফোর্স সদস্যরা তাদের কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করবেন। একই সাথে সাধারণ জনগোষ্ঠীও কমিশনে অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। পদ্ধতিগতভাবে কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ফলে কমিশনের কাজও সহজ এবং গতিশীল হবে এবং এক্ষেত্রে এই পুস্তিকা বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা আশাবাদী।

অ্যাডভোকেট সানাইয়া ফাহীম আনসারী
উর্দ্ধতন উপ-পরিচালক
জেন্ডার এন্ড সোস্যাল জাস্টিস প্রোগ্রাম
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

সূচিপত্র

- মানবাধিকারের ধারণা ১
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দায়দায়িত্ব ২
- মানবাধিকারকর্মী এবং তাদের দায়িত্ব ৫
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ ৭
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা ৯
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের : প্রশ্ন প্রশ্নে জানা ১৪
- সংযুক্তি
  - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যদের পরিচিতি ৩৭
  - মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগ পরিচালনার ধাপ ৪৫
  - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ৪৬
  - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ফরম ৪৭
  - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ ৫১

মানবাধিকারের ধারণা

মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষের মর্যাদার সঙ্গে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এই অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, মানুষ হিসেবে এ অধিকার তার প্রাপ্য। পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার জন্য মানুষের এই অধিকার দরকার। এক কথায় **মানবাধিকার হলো 'সব ধরনের ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি'**। মানবাধিকারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন– এই অধিকারগুলো সর্বজনীন। অর্থাৎ পৃথিবীর সব মানুষ, তিনি যে দেশেরই হোন না কেন, গ্রামে বা শহরে যেখানেই বাস করুন, যে ধর্মেরই হোন, সবার সমান অধিকার থাকবে। একইভাবে সব মানুষ তিনি নারী-পুরুষ-শিশু যা-ই হোন না কেন, যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, আদিবাসী বা 'ভিন্নভাবে সক্ষম' যাই হোন না, সবার অধিকার হবে সমান। মানবাধিকারের নীতি হচ্ছে, এই অধিকারগুলো কেউ কখনো কারো কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। এমনকি কোনো মানুষ নিজেও কখনো তার মানবাধিকার ত্যাগ করতে পারে না। মানবাধিকার বিভিন্ন ধরনের। যেমন– জীবনের অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলার, চলাফেরা করার অধিকার ইত্যাদি। আবার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির অধিকারও মানবাধিকার। এই বিভিন্ন ধরনের অধিকার একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মনে করুন, কালাম নামের একজন মানুষ। তিনি যদি শিক্ষার অধিকার না পান অর্থাৎ লেখাপড়া না জানেন তাহলে কোন ওষুধের কী গুণ, কোন ওষুধ কতটুকু খেতে হবে, সেটির মেয়াদ আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি ভালো জানতে পারবেন না। এতে তার স্বাস্থ্যের অধিকার ব্যাহত হবে। অর্থাৎ শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে রয়েছে স্বাস্থ্যের অধিকারের সম্পর্ক। অথবা কিশোরী লিপির কথা ধরা যাক। ক'দিন ধরে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ। কারণ স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তার মোড়ে কিছু বখাটে ছেলে প্রতিদিন তাকে আজেবাজে কথা বলে। লিপির স্কুলে যেতে ভয় করে।

অর্থাৎ শিক্ষার সাথে রয়েছে নিরাপত্তার সম্পর্ক। আবার ধরা যাক, রাবেয়া লেখাপড়া জানেন না। ফলে প্রসবকালীন পরিচর্যার বিষয় তার কম জানা, তাতে করে তার স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি এবং তার জীবনহানির আশঙ্কাও বেশি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে জীবনের অধিকারের সম্পর্ক পাওয়া যায়। এভাবেই **মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলো একটি আরেকটির ওপর নির্ভরশীল।**

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দায়দায়িত্ব

অধিকার ও দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক। অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারী এবং অধিকার ভোগকারী উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। উভয়পক্ষ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন না করলে অধিকার বাস্তব রূপ পায় না। মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকারের। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিন ধরনের দায়িত্ব রয়েছে। এক. **মানবাধিকারকে সম্মান করা** অর্থাৎ রাষ্ট্রের তরফ থেকে মানবাধিকার ভোগে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করা চলে না; যেমন– রাষ্ট্রীয় বাহিনী কাউকে অন্যায়ভাবে আটক করবে না বা নির্যাতন করবে না। আবার রাষ্ট্র এমন কোনো আইন করবে না যা মানবাধিকারের পরিপন্থী। দুই. **মানবাধিকার রক্ষা করা** অর্থাৎ কেউ যেন অন্যের মানবাধিকার লঙ্ঘন না করতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়া। যেমন– মানবাধিকার রক্ষায় আইন প্রণয়ন করা, অপরাধীকে আটক করা, বিচার করা, শাস্তি দেয়া ইত্যাদি। তিন. **মানবাধিকার পূরণ করা** অর্থাৎ উদ্যোগ বা কর্মসূচি নেয়া, প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, টাকাপয়সা বরাদ্দ করা ইত্যাদি।

মানবাধিকার রক্ষার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও অনেক সময় আমরা দেখি– আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করে। যেমন– ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা। এটা রাষ্ট্র করতে পারে, যদি সেটা হয় সবার মানবাধিকার রক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যদি সত্যিই এমন কারণ থাকে যে, কিছু মানুষের সভা-সমাবেশের অধিকার আরো অনেক মানুষের চলাচলের অধিকার বা নিরাপত্তার অধিকারের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ, তাহলে রাষ্ট্র মানবাধিকারের বৃহত্তর স্বার্থে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে। তবে মানবাধিকারের নীতি হচ্ছে– রাষ্ট্রের এই পদক্ষেপ হতে হবে যুক্তিসংগত এবং সাময়িক। অবশ্য **কিছু কিছু অধিকার রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই সঙ্কুচিত করতে পারে না**। যেমন– জীবনের অধিকার, নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার ইত্যাদি।

অন্যদিকে মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে মানবাধিকার ভোগকারীর অর্থাৎ জনগণেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। নিজের মানবাধিকার ভোগের সময় মনে রাখতে হবে, যেন অন্যরাও একইভাবে তাদের মানবাধিকার ভোগ করতে পারে। তাই **নিজের কারণে যেন অন্যের মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে সবসময়**। তাছাড়া নিজের কাজ দ্বারা মানবাধিকার ভোগ ও চর্চার পরিবেশ যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যেমন– ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি করে তাদের সভা-সমাবেশে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে না।

মানবাধিকারকর্মী এবং তাদের দায়িত্ব

আমাদের সমাজে আমরা এমন অনেককে দেখি যারা অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক বড় বড় অর্জন, যেমন ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অথবা ফুলবাড়ী, কানসাটের মতো জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে এমন অনেক মানুষের অবদান রয়েছে। আমাদের চারপাশেও কিন্তু এমন মানুষ দেখা যায়, যারা আমাদের সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। ধরা যাক, মনিকা রানীর কথা। যে কোনো মানুষের বিপদের কথা শুনলেই তিনি ছুটে যান। সেটা নারী নির্যাতনের ঘটনাই হোক আর এলাকার টিউবওয়েল বা রাস্তাঘাটের সমস্যাই হোক।

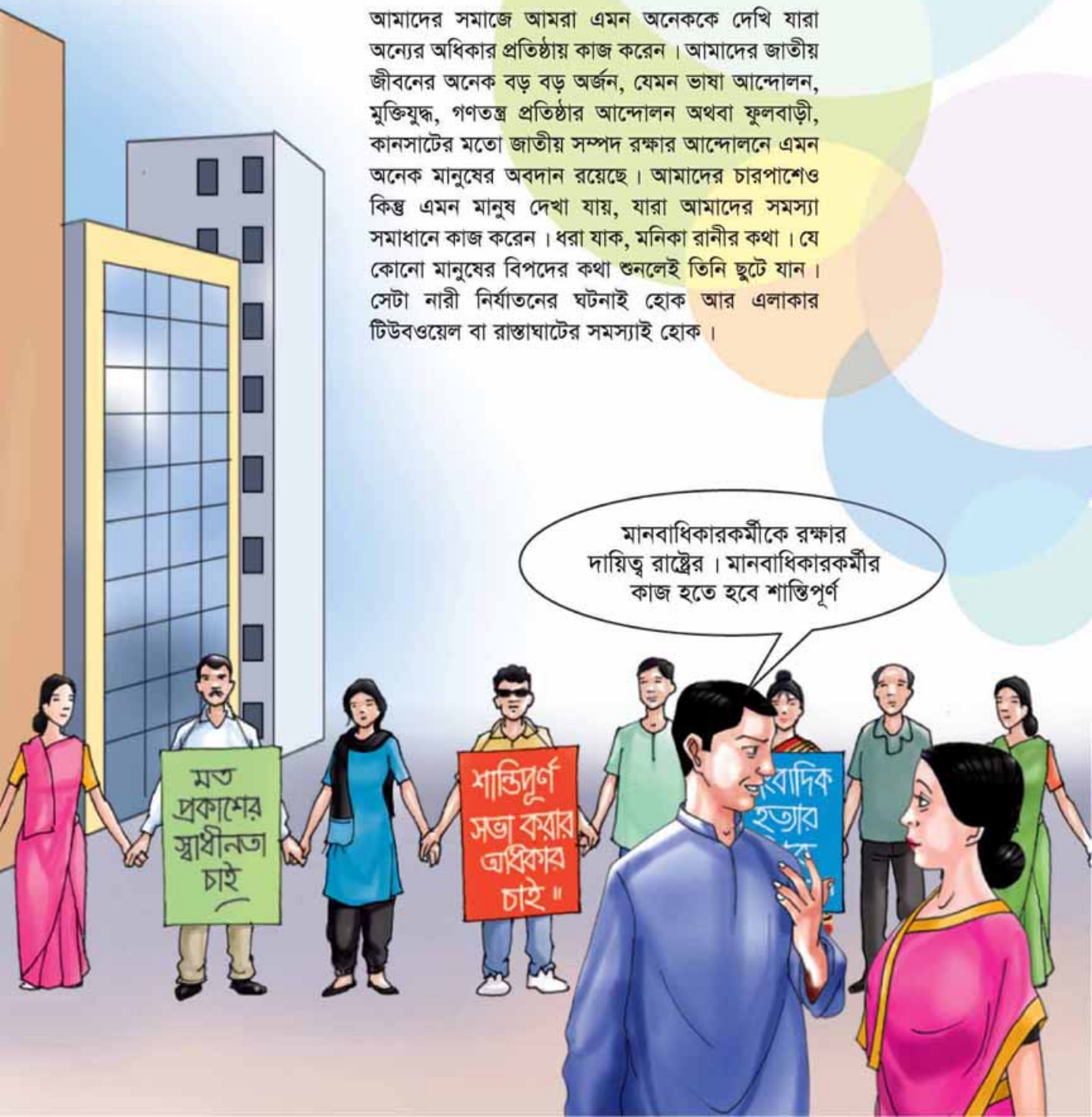

তিনি প্রথমে সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করেন, এই সমস্যা সমাধানে কার বা কাদের কী দায়িত্ব রয়েছে সেটা অন্যদের সাথে আলোচনা করেন। তারপর অন্যদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছে যান, থানা বা আদালতে যান, অফিস-আদালতে ছোটেন। কখনো আবার সবাইকে নিয়ে মিছিল-মিটিংও করেন। মনিকা রাণী একা নন, এমন অনেক মানুষ রয়েছেন আমাদের মধ্যে। এই মানুষরাই মানবাধিকারকর্মী। ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক থেকে শুরু করে যে কোনো সাধারণ মানুষই হতে পারেন মানবাধিকারকর্মী, যদি তিনি কাজ করেন অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। জাতিসংঘও তাদের মানবাধিকারকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে এক ঘোষণায় মানবাধিকারকর্মীদের রক্ষা করতে রাষ্ট্রের কী দায়িত্ব সেটা বলে দিয়েছে জাতিসংঘ। মানবাধিকারকর্মীদের দায়িত্বের কথাও রয়েছে ওই ঘোষণায়। সেটা হচ্ছে– **মানবাধিকারকর্মীর কাজ হতে হবে শান্তিপূর্ণ, কোনো অবস্থাতেই কোনোরকম সহিংসতা করা যাবে না।** মানবাধিকারকর্মীদের কাজের অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। আমরা এখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে আলোচনা করব।

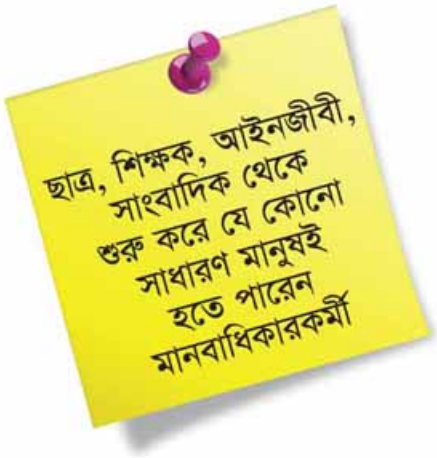

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

আমরা আগেই জেনেছি যে, মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকারের। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একদিকে থাকে অধিকারভোগী বা অধিকারবঞ্চিত জনগণ, আর অন্যদিকে থাকে রাষ্ট্র বা সরকার। তাই তারা একে অন্যের মুখোমুখি হয়। এই মুখোমুখি অবস্থান কখনো বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, আবার কখনো হয় না। মাঝে মধ্যে উভয়ের মধ্যে দূরত্বও তৈরি হয়। তাই কখনও কখনও কাউকে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হচ্ছে এ ধরনের মধ্যস্থতার ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান। **জনগণ যেন তাদের দাবি নিয়ে রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছতে পারে তার জন্য সেতু হিসেবে কাজ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন**। আবার রাষ্ট্র বা সরকারও যেন সহজে জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তার দায়িত্বের অংশ হিসেবে রাষ্ট্র নিজেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে।

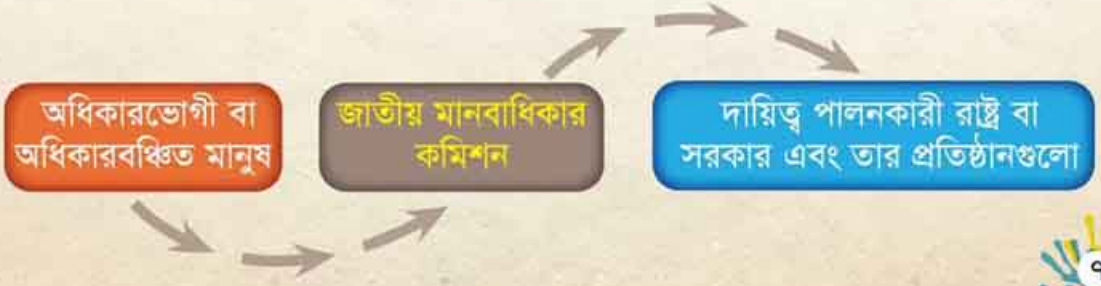

মানবাধিকার নিয়ে অনেক বেসরকারি সংগঠনও কিন্তু কাজ করে। তবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো বেসরকারি সংগঠন নয়। এটা আবার সরকারি অফিসও নয়। এটি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। কারণ, রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে এটি তৈরি করেছে। অন্যদিকে এটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের কাছ থেকে তারা টাকাপয়সা পায় বটে, কিন্তু রাষ্ট্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের টাকাপয়সার প্রকৃত মালিক জনগণ, রাষ্ট্র এর জিম্মাদার মাত্র।

বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে, তিনজন সদস্য নিয়ে। পরে ২০০৯ সালের জুন মাসে এটি আবার পুনর্গঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও পাঁচজন খণ্ডকালীন সদস্য অর্থাৎ মোট সাতজনকে নিয়ে বর্তমান কমিশন গঠিত। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই পুস্তিকার শেষাংশে রয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা বা এখতিয়ার ব্যাপক। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর মাধ্যমে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইন অনুযায়ী মানবাধিকার কমিশন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে। **কমিশনে কেউ অভিযোগ না করলেও কমিশন নিজ উদ্যোগে অভিযোগ নিতে পারে**। কমিশন যে কোনো ব্যক্তিকে তলব করতে পারে এবং তার কাছ থেকে কাগজপত্র চাইতে পারে। এরপর কমিশন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত এবং মধ্যস্থতা করতে পারে। প্রয়োজনে কাউকে জরিমানাও করতে পারে। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ করতে পারে। আইনের বিধান মতে সরকারকে অবশ্যই সেই সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

জেলখানা, হাসপাতাল পরিদর্শন

জেলখানা, কয়েদখানা, থানা হেফাজত এসব স্থানে অনেক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ শোনা যায়। মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করে সেখানকার অবস্থা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে পারে। তাছাড়া হাসপাতাল, এতিমখানা, শিশুসদন এসব স্থানও পরিদর্শন করতে এবং সেসব স্থানের উন্নয়নে সুপারিশ করতে পারে। যেমন– মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি শিশুসদন পরিদর্শন করেছেন। এসব পরিদর্শনে তিনি দেখেন যে, সেখানকার শিশুদের খাওয়ার জন্য দৈনিক যে বরাদ্দ তা খুবই কম। তাছাড়া শিশুসদনগুলোতে রাঁধুনী না থাকায় সেখানকার শিশুদেরই রান্না করতে হয়। এরপর **জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশে সরকার শিশু সদনগুলোতে দৈনিক খাবারের টাকা বাড়িয়েছে। আর প্রতিটা শিশুসদনে একজন করে রাঁধুনী নিয়োগ দিয়েছে।**

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইন খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশের যে কোনো আইন পর্যালোচনা করতে পারে এবং সেগুলো পরিবর্তনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে। মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রমের ব্যাপারেও মতামত দিতে পারে মানবাধিকার কমিশন। যেমন- **শিশু আইন, প্রতিবন্ধী (ভিন্নভাবে সক্ষম) ব্যক্তির অধিকার আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ইত্যাদিতে মানবাধিকার কমিশন তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছে।**

আইন পর্যালোচনা করে তা পরিবর্তনের সুপারিশ করতে পারে মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকারের বিষয় প্রচার করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

তাছাড়া মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করতে পারে এবং সভা-সমাবেশ বা প্রকাশনার মাধ্যমে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয় প্রচার করতে পারে। মানবাধিকার কমিশন তাদের কাজের শুরুতেই মানবাধিকার বিষয়ে মানুষের জানাশোনা কেমন তা পর্যালোচনার জন্য দেশব্যাপী একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। **সেই গবেষণা থেকে পাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে কমিশন এখন কাজ করছে।**

মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণও দিতে পারে। যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনকে, এমনকি পুলিশ, র‍্যাব ইত্যাদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকেও কমিশন এই প্রশিক্ষণ দিতে পারে। **কমিশন ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে।**

আইনগত সহায়তা দিতে পারে মানবাধিকার কমিশন

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার যে কোনো মানুষকে প্রয়োজনে আইনগত সহায়তা দিতে পারে মানবাধিকার কমিশন। এছাড়া আইনে বলা হয়েছে, মানবাধিকার রক্ষায় নিজেদের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের
প্রশ্নে প্রশ্নে জানা

আগের আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, যদি আমরা মনে করি, আমাদের কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, তাহলে আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে পারি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নেয়া এবং তার সমাধানে কাজ করা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের বিষয়টি চলুন প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি।

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন আলাদা করে বুঝতে হবে

মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা কেমন করে বুঝব?

আমরা অনেক সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টাকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি না। যে কোনো অন্যায় বা অপরাধকেই আমরা সাধারণভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করি। আমাদের মনে রাখতে হবে– **একটি অপরাধ বা অন্যায় ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেটি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় না**। যদি দেখা যায়, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেউ তার পদ বা ক্ষমতা ব্যবহার করে ওই অন্যায়টি করেছে অথবা ওই অন্যায় প্রতিহত করতে রাষ্ট্রের অবহেলা ছিল, তাহলে সেটি হবে মানবাধিকার লঙ্ঘন। অর্থাৎ মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে তিন ধরনের দায়িত্ব অর্থাৎ মানবাধিকারকে সম্মান করা, রক্ষা করা এবং পূরণ করা– এর কোনো একটির ঘাটতি যদি হয় তবেই আমরা একে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলতে পারব। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, আমাদের এলাকার একজন প্রভাবশালী লোক একজন গরিব মানুষের বসতভিটা জোর করে দখলের চেষ্টা করছেন। তিনি বিভিন্নভাবে ওই গরিব মানুষকে উৎপাত করেন, ভয় দেখান, হুমকি দেন। একদিন তাকে মারধরও করেন। গরিব মানুষটি তখন গেলেন থানায়। থানা তার অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিল, পুলিশ দ্রুত তদন্ত করতে এলো, মামলা হলো। এলাকার জনপ্রতিনিধিও ওই গরিব মানুষটিকে সহায়তা করলেন, আদালতে বিচার হলো এবং প্রভাবশালী লোকটি শাস্তি পেলেন। এই ঘটনায় প্রভাবশালী লোকটি যে গরিব মানুষটিকে মারধর করেছিলেন সেটি ছিল অপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। কিন্তু ঘটনাটি যদি অন্যরকম হয়? যেমন– গরিব মানুষটি যখন থানায় গেলেন তখন পুলিশ তাকে গুরুত্বই দিল না, তার অভিযোগ গ্রহণ করল না, তদন্তও করল না। গরিব মানুষটি আদালতে গিয়ে মামলা করলেন। কিন্তু দেখা গেল পুলিশ প্রভাবশালী লোকটির পক্ষেই তদন্ত প্রতিবেদন দিল। এ কারণে বিচারে প্রভাবশালী লোকটির কোনো শাস্তিই হলো না, বরং গরিব মানুষটি আরো আতঙ্কের মধ্যে পড়ল। এরকমটা হলে এটি আর শুধু অপরাধ থাকে না, এটি হয়ে যায় মানবাধিকার লঙ্ঘন। কারণ এ ক্ষেত্রে গরিব মানুষটির সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষায় রাষ্ট্রের যে দায়দায়িত্ব ছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাই কোনো বিষয়কে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত করার সময় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের অবহেলাকেও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হয়।

২ মানবাধিকার কমিশনে কী ধরনের অভিযোগ করা যাবে?

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টা বোঝার পর নিশ্চয়ই এখন মনে হচ্ছে মানবাধিকার কমিশনে আমরা কী ধরনের অভিযোগ করতে পারি সেটা জানা দরকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ধরনের অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে সেটা বলা আছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনে (*আইনটি পাবেন এই পুস্তিকার শেষ অংশে*)। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই আপনার জীবন, অধিকার, সমতা ও মর্যাদাহানির কোনো ঘটনা ঘটলে অথবা অন্যের এ ধরণের অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকারে আপনি মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তবেই শুধু আপনি অভিযোগ করতে পারবেন তা নয়, যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার বা অন্য কারো মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তাহলেও আপনি মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন। মনে করুন, আপনার এলাকায় বসবাসকারী বাউল সম্প্রদায়ের ওপর কিছু লোক হামলা চালিয়ে তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করল, বাউলদের চুল-দাড়ি কেটে দিল, তাদের মেরে ফেলার হুমকি দিল। বাউলরা থানায় মামলা করতে গেল। কিন্তু পুলিশ মামলা না নিয়ে জিডি করে রাখল, আর কিছুই হলো না। এটা বাউলদের জীবন, অধিকার ও মর্যাদার লঙ্ঘন এবং এখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করল না। তাই এটি একটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী বাউলরা বা তাদের পক্ষে আপনি বা অন্য যে কেউ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

জীবন, অধিকার সমতা ও মর্যাদাহানি হলে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যাবে

৩ মানবাধিকার কমিশনে কে অভিযোগ করতে পারেন?

যে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অভিযোগ করতে পারে

যে কেউই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নারী, পুরুষ, 'ভিন্নভাবে সক্ষম' যে কেউ অভিযোগ করতে পারবেন। গ্রামের বা শহরের, সমতলের বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ধনী, গরিব, কৃষক, শ্রমিক, মজুর– তিনি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাই হোন না কেন মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন। ভুক্তভোগী ব্যক্তি নিজে অভিযোগ করতে পারেন বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও অভিযোগ করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কিন্তু নিজ উদ্যোগেও অভিযোগ নিতে পারে। যেমন সংবাদমাধ্যমের খবরের ভিত্তিতে কমিশন অভিযোগ নিতে পারে।

৪ কীভাবে অভিযোগ দায়ের করব?

এখন নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে, কীভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যায় সেটা জানা দরকার! সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে দরখাস্ত আকারে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্ধারিত ফরম পূরণ করেও অভিযোগ করতে পারেন। আপনার অভিযোগ হাতে হাতে কমিশনের কর্মকর্তাকে পৌঁছে দিতে পারেন, কমিশনের অফিসে রাখা অভিযোগ বাক্সে ফেলতে পারেন। ডাক, কুরিয়ার, ফ্যাক্স বা ই-মেইলের মাধ্যমেও আপনার অভিযোগ পাঠাতে পারেন। দরখাস্ত চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বরাবর লিখবেন।

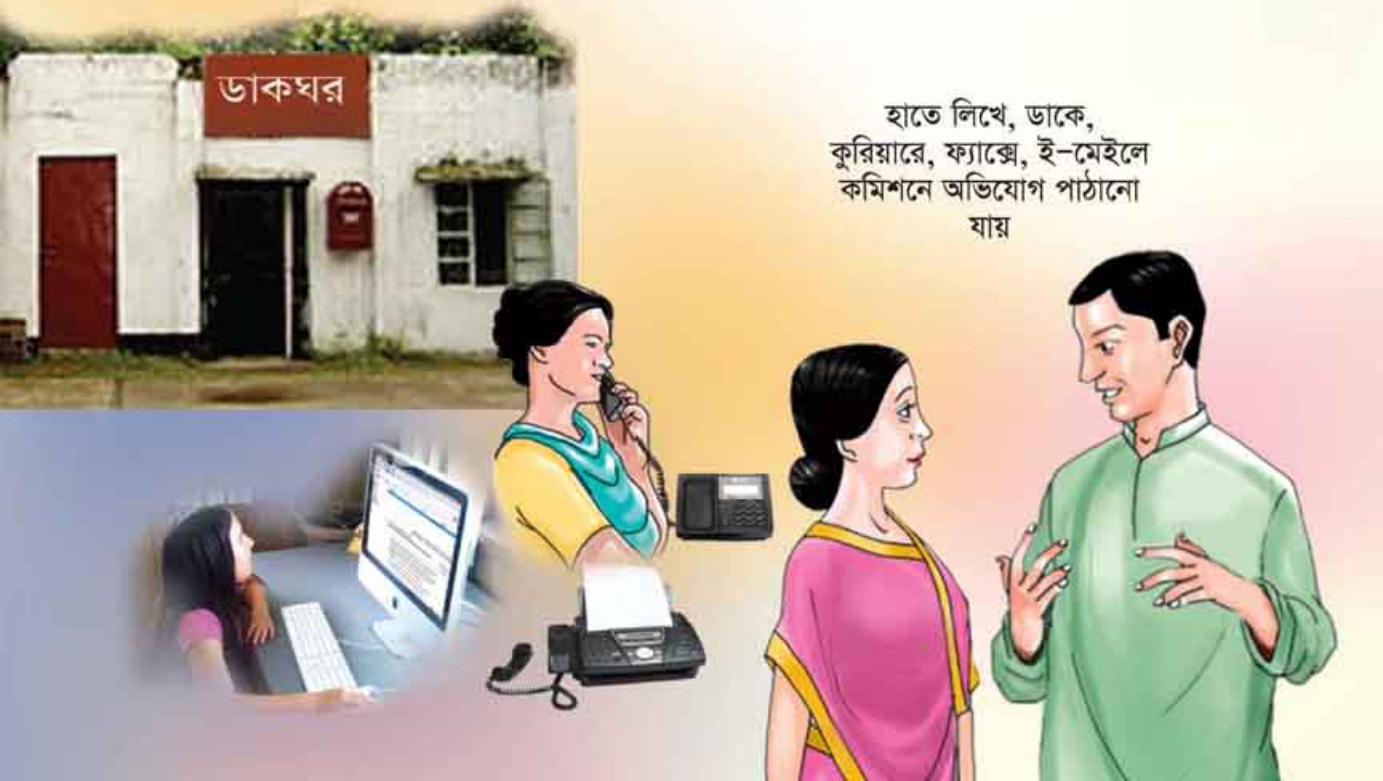

হাতে লিখে, ডাকে, কুরিয়ারে, ফ্যাক্সে, ই-মেইলে কমিশনে অভিযোগ পাঠানো যায়

৫ অভিযোগ দায়েরের জন্য কমিশনের নির্ধারিত ফরম কীভাবে পাওয়া যাবে?

অভিযোগ দায়েরের সুবিধার্থে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি ফরম তৈরি করেছে। এই পুস্তিকার শেষে তার একটি কপি সংযুক্ত আছে। সেটা ফটোকপি করে ব্যবহার করতে পারেন অথবা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলে www.nhrc.org.bd এই ওয়েবসাইটে গিয়ে অভিযোগ দায়ের (file complaint) অংশে ক্লিক করে সেখানেই সরাসরি ফরম পূরণ করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন অথবা সেখান থেকে ফরম নামিয়ে পরে তা পূরণ করে পাঠিয়ে দিতে পারবেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে।

www.nhrc.org.bd
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওয়েবসাইট

৬ ইন্টারনেটে সরাসরি ফরম পূরণ করে পাঠালে কীভাবে বুঝব যে সেটি ঠিকভাবে পৌঁছেছে?

ইন্টারনেটে ঠিকভাবে ফরম পাঠানোর সাথে সাথে আপনি একটি ফিরতি বার্তা পাবেন। সেই বার্তায় আপনাকে একটি নির্দিষ্ট নম্বর দেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে আবার মানবাধিকার কমিশনের ওয়েবসাইটে ঢুকে এই নম্বর ব্যবহার করে আপনার অভিযোগ কোন পর্যায়ে রয়েছে তা আপনি জানতে পারবেন।

৭ ডাকযোগে, কুরিয়ারে বা ফ্যাক্সে অভিযোগ পাঠালে তা পৌঁছেছে কিনা সেটা কীভাবে বুঝব?

ডাকযোগে, কুরিয়ারে, ফ্যাক্স বা ই-মেইলে পাওয়া অভিযোগ কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সাথে সাথে কম্পিউটারে নিবন্ধন করেন এবং অভিযোগটিতে একটি নির্দিষ্ট নম্বর বসান। তাই আপনার অভিযোগ পাঠানোর পর আপনাকে মানবাধিকার কমিশনে ফোন করে ওই নম্বরটি জেনে নিতে হবে। তারপর এই নম্বর ব্যবহার করে কমিশনের ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি আপনার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন।

৮ ইন্টারনেটে সরাসরি ফরম না পাঠালে সেক্ষেত্রে আমি কীভাবে আমার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারব?

ইন্টারনেটে অভিযোগ না পাঠিয়ে আপনি যদি হাতে হাতে মানবাধিকার কমিশনের কার্যালয়ে আপনার অভিযোগ জমা দেন, তাহলে সেখানে দায়িত্বরত কর্মী সাথে সাথে আপনার অভিযোগটি কম্পিউটারে টাইপ করে আপনাকে একটি অনুসন্ধান নম্বর দেবে, যা ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে আপনি ইন্টারনেটে আপনার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। কমিশন কার্যালয়ে ফোন করে আপনার নম্বরটি বললে তারাও আপনার অভিযোগটি কোন অবস্থায় রয়েছে তা আপনাকে বলে দিতে পারবে।

৯ অভিযোগ সম্পর্কে জানার জন্য কী নির্দিষ্ট কোনো ফোন নম্বর রয়েছে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিগগিরই একটি বিশেষ নম্বর (হটলাইন নম্বর) চালু করবে। যে কোনো টেলিফোন বা মোবাইল থেকে এই নম্বরে ফোন করে অভিযোগ করতে পারবেন বা আপনার অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। হটলাইন নম্বর না হওয়া পর্যন্ত (+৮৮ ০২) ৮৩৩১৪৯২ নম্বরে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফোন করে আপনার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

হটলাইন নম্বরে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করা যায়

১০ হটলাইনের মাধ্যমে কী আমি মানবাধিকার কমিশন থেকে তাৎক্ষণিক কোনো সাহায্য পেতে পারি?

অবশ্যই। হটলাইনের উদ্দেশ্যই মূলত ভুক্তভোগীকে জরুরি পরামর্শ দেয়া অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কার প্রেক্ষিতে তাকে জরুরিভাবে সাহায্য করা। আপনি যদি আইন বা মানবাধিকার বিষয়ে কোনো পরামর্শ চান অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কায় যদি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে জরুরি সহায়তা চান, তাহলে এই হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। হটলাইন নম্বর চালু হলে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য এই পুস্তিকার পরবর্তী সংস্করণে দেয়া হবে।

১১ কার বা কাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়?

মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী তিনি যেই হোন না কেন তার বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর পদ, পদবি, পরিচয়, অর্থনৈতিক অবস্থা কোনো কিছুই কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। তার কাজের মাধ্যমে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় বা লঙ্ঘনের আশঙ্কা তৈরি হয় তাহলেই তার বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন।

১২ কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যায়?

সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা 'জনসেবক' হিসেবে পরিচিত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইন অনুযায়ী কোনো জনসেবক যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেন বা মানবাধিকার লঙ্ঘনে প্ররোচনা দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। শুধু তাই নয়, জনসেবক হিসেবে যেহেতু মানবাধিকার রক্ষা করা তার দায়িত্ব, তাই তার দায়িত্বের অবহেলার কারণে যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে তাহলেও তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

জনসেবকের দায়িত্বে অবহেলার কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যাবে

১৩ কোনো সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে সেক্ষেত্রে কি মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যাবে?

নিশ্চয়ই যাবে। যে কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে অথবা লঙ্ঘন করতে প্ররোচনা দেয় তবে তার বা তাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। মানবাধিকার কমিশন নিজ উদ্যোগেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে।

সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করা যাবে

১৪ কোনো বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ করা যাবে?

অবশ্যই যাবে। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে যে কারো বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা যাবে যদি তার দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে অথবা ঘটার আশংকা তৈরী হয়। তাই কোনো বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে সে অভিযোগ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে করা যাবে।

১৫ মানবাধিকার কমিশনের কেউ যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাহলে আমরা কী করব?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার দেয়া। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কর্মীদের জন্য চাকরিবিধি তৈরি করেছে। তাই তাদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে চাকরিবিধি অনুযায়ী কমিশনের কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া কমিশনের যে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনো অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে অন্যদের মতোই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

১৬ মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে কী কোনো টাকাপয়সা খরচ হয়?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে। জনগণের করের টাকা থেকে সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। তাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর কোনো টাকা-পয়সা খরচ হয় না। শুধু অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে নয়, অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া, অভিযোগ করার আগে পরামর্শ করা ইত্যাদি কোনো সময়েই অভিযোগকারীকে কোনো টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না।

মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করার ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর কোনো টাকাপয়সা খরচ হয় না

১৭ মানবাধিকার কমিশন কীভাবে অভিযোগ যাচাই-বাছাই করে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের একটি অভিযোগ বাছাই কমিটি রয়েছে। যে কোনো অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তারা অভিযোগটির আইনগত দিক পরীক্ষা করে দেখে। যদি দেখা যায়, অভিযোগের বিষয়টি মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ারের বাইরে, তাহলে অভিযোগকারীকে সেটা জানানো হয় এবং এ অবস্থায় তার কী করণীয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়। সাধারণত অভিযোগ পাওয়ার পর তিনদিনের মধ্যে এটি করা হয়। আপনার অভিযোগ অনুসন্ধান নম্বর ব্যবহার করে আপনি এই পরামর্শ কমিশনের কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবেন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে পারবেন।

১৮ কোন কোন বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন অভিযোগ নেয় না?

আমরা আগেই জেনেছি যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব বিষয়ই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিযোগ হিসেবে নেয়। তবে যেহেতু জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল নয়, তাই রাষ্ট্রের এক প্রতিষ্ঠানের কাজের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানের কাজের যেন ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার বা ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে। যেমন, আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার বিষয় কমিশন অভিযোগ হিসেবে নিতে পারে না অথবা সরকারি কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত এমন কোনো বিষয় যা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য সে বিষয়ে কোনো অভিযোগ নিতে পারে না। তবে এসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন ইচ্ছা করলে কোনো ভুক্তভোগীকে আইনগত সহায়তা দিতে পারবে এবং তার পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারবে। এক্ষেত্রে আইনজীবীর খরচ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বহন করবে।

১৯ আদালতে বিচারাধীন বলতে কী বুঝব?

কোনো বিষয় নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করলে তখন থেকেই এটি বিচারাধীন বলে বিবেচিত হবে নাকি তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিলের পর থেকে বিচারাধীন হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। মানবাধিকার কমিশন বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছে। বর্তমানে আমাদের দেশে চার্জ গঠন না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি বিচারাধীন বলে বিবেচনা করা হয় না। ভারতেও তাই করা হয়। বিষয়ে স্পষ্ট সংজ্ঞা তৈরি করে কমিশন তাদের বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করবে। এই পুস্তিকার পরবর্তী সংস্করণে এটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

২০ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য বিষয় কোনগুলো?

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কিছু গণপ্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চাকরি ও পেনশন সম্পর্কিত বিষয়গুলো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই গণপ্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে–

- সোনালী, অগ্রণী ও জনতা ব্যাংক
- বাংলাদেশ ব্যাংক
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক
- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন
- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
- ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ
- গ্রামীণ ব্যাংক
- বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ
- কর্মসংস্থান ব্যাংক
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, উপরের প্রতিষ্ঠানগুলো বা অন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা কেউ যদি তার চাকরি বা পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ করতে চান তবে তাকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। কিন্তু ওই ব্যক্তি যদি কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হন, তাহলে তিনি অবশ্যই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করতে পারবেন। আবার তিনি যদি কারো মানবাধিকার লঙ্ঘন করেন তবে তার বিরুদ্ধেও মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করা যাবে।

২১ কোনো অভিযোগ কমিশনের এখতিয়ারে না পড়লে সেক্ষেত্রে কমিশন কী করে?

যাচাই-বাছাই করার সময় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যদি দেখে যে, কোনো অভিযোগ তাদের এখতিয়ারে পড়ছে না, তাহলে কেন সেটা তাদের এখতিয়ারের বাইরে তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে তা অভিযোগকারীকে জানায়। কিন্তু এরপরও কীভাবে অভিযোগকারীকে সাহায্য করা যায় বা অভিযোগকারীকে অন্য কোনো পরামর্শ দেয়ার থাকলে সেটাও তারা লিপিবদ্ধ করে অভিযোগকারীকে জানায়। এ বিষয়ে অভিযোগকারীর জন্য সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো অনুরোধপত্র লিখতে হয়, সেটাও কমিশন করে থাকে। ধরুন, জামাল হোসেন একটি সরকারি ব্যাংকের কর্মচারী। তার চাকরি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে তিনি কমিশনে অভিযোগ করলেন। কমিশন যাচাই-বাছাই করে দেখল যে বিষয়টি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য। তাহলে কমিশন তাকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দেবে।

২২ কোনো অভিযোগ গ্রহণ করার পর কমিশন কী করে?

কোনো অভিযোগ গ্রহণের পর সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা বিবেচনা করে কমিশন। তদন্তের পর অথবা তদন্ত ছাড়া কাগজপত্র পরীক্ষা করেই কমিশন যদি মনে করে অভিযোগের সত্যতা রয়েছে, তাহলে কমিশন বিষয়টি নিয়ে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে মধ্যস্থতার আয়োজন করে। কী প্রক্রিয়ায় এই মধ্যস্থতা করা হবে সেটা ঠিক করার জন্য মানবাধিকার কমিশন শিগগিরই একটি বিধিমালা বা নির্দেশিকা তৈরি করবে। এই পুস্তিকার পরবর্তী সংস্করণে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে।

২৩ মধ্যস্থতা সফল না হলে তারপরে কমিশন কী করে?

যদি মধ্যস্থতা সফল না হয় তবে কমিশন সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করে। শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণই নয়, সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্যও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হতে পারে ওই ব্যক্তির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ। যেমন, যদি এটি কোনো পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয় তাহলে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

২৪ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী কমিশনের সুপারিশ মানতে বাধ্য?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্য রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটা আবার কমিশনকে জানাতেও হয়। মানবাধিকার কমিশনের আইনে বলা আছে– মানবাধিকার কমিশন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে সুপারিশ বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন চাইলে সেটা প্রদান করা ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। আর তারা যদি তা না করে তবে সে বিষয়ে কমিশন প্রতিবেদন তৈরি করে রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উত্থাপন করবেন।

২৫ মানবাধিকার কমিশন কতদিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে?

অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যাপারটি একেক অভিযোগের ক্ষেত্রে একেক রকম হবে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া কঠিন। আবার আপনি হয়তো একটি অভিযোগ নিয়ে কমিশনে এসেছেন, দেখা গেল সেটা নিয়ে কমিশন কাজ শুরু করার পরে ওই সমস্যাকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হলো। তাই অভিযোগ নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা সবসময় সম্ভব নয়। তবে মানবাধিকার কমিশন এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকে যেন যতটা সম্ভব দ্রুততার সাথে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যায়। নীতিগতভাবে কমিশন সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে যে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। এর বেশি সময় লাগলে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ তা অভিযোগকারীকে জানানো হয়।

২৬ মানবাধিকার কমিশন কী কাউকে তলব করতে পারে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে কমিশনের দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো সাক্ষীকে কমিশন সমন দিতে পারে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারে। কমিশন যে কোনো ব্যক্তিকে তলব করতে পারে এবং তার কাছে থাকা নথিপত্র বা দলিল হাজির করতে বলতে পারে।

তদন্তের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

২৭ কমিশন কাউকে হাজির হতে বাধ্য করতে পারে?

যেহেতু আমরা দেখেছি যে, অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা রয়েছে, তাই কমিশন কাউকে হাজির হতে বাধ্যও করতে পারে। এক্ষেত্রে কমিশন দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে কীভাবে এটি করা হবে তা বিস্তারিতভাবে কমিশনের বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত হবে। এই পুস্তিকার পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবো।

মানবাধিকার কমিশন কাউকে হাজির করতে দেওয়ানি আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে

২৮ কমিশন কী কাউকে শাস্তি দিতে পারে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো আদালত নয়। তাই কমিশন সরাসরি কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু কমিশনের তদন্তে যদি কারও বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অথবা লঙ্ঘনে প্ররোচনা দেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে কমিশন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারবে। এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যও সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারে।

মানবাধিকার কমিশন শাস্তি দিতে পারে না তবে জরিমানা করতে পারে

২৯ মানবাধিকার কমিশন কী কাউকে জরিমানা করতে পারে?

হ্যাঁ, শাস্তি দিতে না পারলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জরিমানা করতে পারে। কোনো বিষয়ে মধ্যস্থতা করার সময় মধ্যস্থতা সফল করতে যে কোনো পক্ষকে প্রয়োজনে জরিমানা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে মানবাধিকার কমিশন। কমিশন শিগগিরই মধ্যস্থতা বিষয়ে তাদের বিধিমালা প্রণয়ন করবে। পরবর্তী সংস্করণে ওই বিধিমালা এবং জরিমানা আদায়ের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

৩০ আদালতের সাথে মানবাধিকার কমিশনের পার্থক্য কী?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো আদালত নয়। এটাকে বলা হয় আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান। মানবাধিকার কমিশন আদালতের কাজে সহযোগিতা করে অথবা ভুক্তভোগীকে আদালতে যেতে সহযোগিতা করে। আবার আদালত কোনো বিষয়ে তদন্তের জন্য মানবাধিকার কমিশনের সাহায্য গ্রহণ করে। যেমন– ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি ঘটনায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নাতি রাকিবকে পেটায় পুলিশ। এ ঘটনাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য হাইকোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অনুরোধ করেন। আবার আদালতের অনুরোধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অনেকগুলো ঘটনায় হাইকোর্টে উপস্থিত থেকে তার মতামত প্রদান করেছেন এবং আদালত সে অনুযায়ী আদেশ দিয়েছেন।

মানবাধিকার কমিশন আদালত নয়

৩১ মানবাধিকার কমিশন কী আমার পক্ষ হয়ে মামলা করতে পারে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যদি মনে করে আপনাকে আইনগত সহায়তা দেয়া প্রয়োজন, তবে আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আপনাকে আইনগত সহায়তা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে আইনজীবীর খরচ মানবাধিকার কমিশন বহন করে। কমিশন চাইলে আপনার পক্ষে মামলাতেও অংশ নিতে পারে। তবে সেটা শুধু হাইকোর্টে রিট মামলার ক্ষেত্রে।

মানবাধিকার কমিশন আইনজীবী দিয়ে সাহায্য করে

৩২ রিট মামলা কোনগুলো?

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে বা অবহেলা করলে তার বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো করা হয় তা রিট মামলা হিসেবে পরিচিত। এ মামলা করতে হয় হাইকোর্টে। যেমন, পুলিশ কাউকে অন্যায়ভাবে আটক করে রাখলে তিনি এর বিরুদ্ধে রিট মামলা করতে পারবেন। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও জনস্বার্থে যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন রিট মামলা করতে পারেন। যেমন, জলাশয় ভরাট করার বিরুদ্ধে, ফতোয়া নিষিদ্ধ করা, শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক রিট মামলা হয়েছে।

৩৩ আমার অভিযোগ কী কমিশন গোপন রাখবে?

অবশ্যই। অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়টি গোপন থাকবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। অনেক সময় এটি তার নিরাপত্তার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকার কমিশন এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। অভিযোগকারী এবং তার অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিই শুধু তা দেখতে পারেন।

মানবাধিকার কমিশন অভিযোগের বিষয় গোপন রাখে

৩৪ অভিযোগ দায়েরের পর কমিশন আমার নিরাপত্তা রক্ষায় কী কোনো উদ্যোগ নেবে?

অবশ্যই নেবে। কমিশনে অভিযোগ দায়েরের কারণে যদি আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় বা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সেটা দ্রুত কমিশনকে জানাবেন। এ ক্ষেত্রে কমিশন প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিশনের ওই নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে।

অভিযোগকারীর নিরাপত্তা দিতে উদ্যোগ নেয় মানবাধিকার কমিশন

৩৫ মানবাধিকার কমিশনের অফিস কোথায়?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অফিস ঢাকার মগবাজারে অবস্থিত। নিচের ঠিকানা ও ম্যাপ অনুসরণ করে আপনি সহজেই মানবাধিকার কমিশনের অফিস খুঁজে পাবেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গুলফেঁশা প্লাজা (১২ তলা)
৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩৬৮৬৩, ফ্যাক্স: ৮৩৩৩২১৯
e-mail: nhrc.bd@gmail.com
website: www.nhrc.org.bd

৩৬ মানবাধিকার কমিশনের কী ঢাকার বাইরে অফিস করার পরিকল্পনা রয়েছে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী মানবাধিকার কমিশন প্রয়োজনে সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। অবশ্য এখনো কমিশন ঢাকার বাইরে কোনো কার্যালয় স্থাপন করেনি। ভবিষ্যতে কার্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা কমিশনের রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথমে বিভাগীয় সদরে অফিস করবে, তারপর পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলাগুলোতে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান

ড. মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। আইন শিক্ষা কার্যক্রমে তাঁর রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। আইনজীবীদের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের যে বার ভোকেশনাল কোর্স রয়েছে, ড. মিজান ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়ক।

দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের মানবাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০০ সাল থেকে তিনি আইন শিক্ষার্থীদের জন্য হিউম্যান রাইটস সামার স্কুল (এইচআরএসএস) পরিচালনা করছেন। বর্তমানে প্রতি বছর ভারত, নেপাল, ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন। ড. রহমান বাংলাদেশে 'প্রতিদিনের আইন' (সহজ ভাষায় দৈনন্দিন আইনি বিষয় শিক্ষা)-এর প্রবর্তক। তিনি ২০০০ সালে এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু ল অব দ্য কমন পিপল (এলকপ) নামে একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মানবাধিকার কমিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

ড. মিজানুর রহমান দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি আটটি গবেষণা গ্রন্থ এবং ৭৫ টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। আইন শিক্ষায় ভূমিকা রাখার কারণে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তিনি ২০১০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা আইন শিক্ষকের মর্যাদা পান।

ড. মিজান গাইবান্ধা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গাইবান্ধার পশ্চিমপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে বোর্ডে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পাস করেন। তিনি শিক্ষাজীবনে সর্বদা প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। তিনি এক কন্যা ও এক পুত্রের জনক।

কাজী রিয়াজুল হক
সার্বক্ষণিক সদস্য

কাজী রিয়াজুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। মাঠ প্রশাসন, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ে ৩৩ বছর চাকরি করে ২০০৬ সালে তিনি সরকারের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজসেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খুলনার জেলা প্রশাসক থাকাকালে তিনি খুলনা ফাউন্ডেশন ও খুলনা শিশু হাসপাতাল নির্মাণ করেন। খুলনার দক্ষিণডিহিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি উদ্ধার করে সেখানে তিনি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেন।

সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের লিগ্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় মানবাধিকার, শিশু অধিকার, কিশোর বিচারব্যবস্থা, মানব পাচার প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন।

রিয়াজুল হক দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইন, জনপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়ন করেছেন।

অধ্যাপক ড. নীরু কুমার চাকমা
অবৈতনিক সদস্য

অধ্যাপক ড. নীরু কুমার চাকমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এবং সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি' বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি শিক্ষকতা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর এবং যুক্তরাজ্য থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

ড. নীরু কুমার চাকমা দর্শন বিষয়ক বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলাপিডিয়ার সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। বৌদ্ধ ধর্ম ও মানবাধিকার বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রয়েছে।

সেলিনা হোসেন
অবৈতনিক সদস্য

সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের একজন সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক। তিনি প্রায় চার দশক ধরে লেখালেখির সঙ্গে সম্পৃক্ত। উপন্যাস, গল্প, শিশু-কিশোর সাহিত্য, প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার ও উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০০৫ সালে তাঁর 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের অনুবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের ওকটন কমিউনিটি কলেজে তিন সেমিস্টারে পাঠ্য হয়েছিল। বর্তমানে তিনি ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক। সেলিনা হোসেন ৩৪ বছর ধরে বাংলা একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি মানবাধিকার ও জেন্ডার ইস্যুতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং আলাওল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১০ সালে তিনি ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত হন। ২০১১ সালে দিল্লির সাহিত্য আকাদেমি তাঁকে দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যিক হিসেবে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ প্রদান করে। তাছাড়া দিল্লির ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার', লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় ব্রিটিশ কাউন্সিল ফেলোশিপ, ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপসহ আরো অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি দিল্লির ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার-এর গভর্নিং কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। বর্তমানে তিনি ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ফৌজিয়া করিম ফিরোজ
অবৈতনিক সদস্য

অ্যাডভোকেট ফৌজিয়া করিম ফিরোজ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী এবং মানবাধিকার ও নারী অধিকার কর্মী। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ), শ্রমিক অধিকার কোয়ালিশন, এসইডব্লিউএ (অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের সংগঠন)-এর সভাপতি। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের আইন সম্পাদক।

অ্যাডভোকেট ফৌজিয়া করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৮২ সালে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। তাছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত থেকে ফেলোশিপ অর্জন করেছেন। আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই লিখেছেন।

আরমা দত্ত
অবৈতনিক সদস্য

নারী অধিকার, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকার এবং মানবাধিকার কর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত আছেন আরমা দত্ত। ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং সুশাসন ও স্থানীয় সরকার বিষয়েও তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে। প্রিপ ট্রাস্ট নামক জাতীয় এনজিওর নির্বাহী পরিচালক তিনি। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাহী সদস্যও তিনি।

নিরূপা দেওয়ান
অবৈতনিক সদস্য

রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নিরূপা দেওয়ান দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জাতীয় সমাজকল্যাণ কাউন্সিল, জেলা মহিলা সংস্থা, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রোটারি ক্লাব ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যও তিনি। ১৯৯৪ সালে তিনি বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশন থেকে 'স্টার অব বাংলাদেশ' উপাধি এবং ২০০১ সালে সেরা গার্লস গাইড শিক্ষিকা হিসেবে স্বর্ণপদক পান।

মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগ পরিচালনার ধাপগুলো

১ কমিশন অভিযোগ গ্রহণ করে।

২ অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন তদন্ত করবে।

৩ তদন্তের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা যদি কমিশনের মনে হয় মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে সমাধান সম্ভব, তবে কমিশন মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেবে।

৪ যদি মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে অভিযোগের সমাধান সম্ভব না হয় তবে সেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য অথবা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করবে।

৫ সুপারিশের একটা কপি কমিশন অভিযোগকারীর কাছেও পাঠাবে।

৬ কমিশন তাদের পাঠানো সুপারিশের বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানতে চাইবে বা সুপারিশের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার ফলোআপ প্রতিবেদনও চাইবে।

৭ কমিশনের চাওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হয় এবং কমিশন যদি প্রয়োজন মনে করে তবে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবে এবং রাষ্ট্রপতি সংসদে বিষয়টি উপস্থাপনের পদক্ষেপ নেবেন।

৮ যদি মধ্যস্থতা সফল হয় তবে এর সমাধানের জন্য কমিশন অন্যান্য দিকনির্দেশনার সাথে সাথে যৌক্তিক পর্যায়ের জরিমানার নির্দেশনা দেবে।

মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়েরের ফরম (Complaints Form)

(ক) অভিযোগকারী সম্পর্কিত তথ্য (Information about the Complainant)

(১) নাম (Name)

(২) লিঙ্গ (Sex) টিক চিহ্ন দিন (Put tick mark) ☐ পুরুষ ☐ নারী ☐ অন্যান্য

(৩) পিতা/স্বামীর নাম
(Father / Husband's name)

(৪) স্থায়ী ঠিকানা (Permanent address)

(৫) বর্তমান ঠিকানা (Present address)

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য (Information about the victim)

(১) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নাম (Name)

(২) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা (Number)

(৩) পিতা/স্বামীর নাম
(Father / Husband's name)

(৪) স্থায়ী ঠিকানা (Permanent address)

(৫) বর্তমান ঠিকানা (Present address)

(৬) ধর্ম (Religion)

(৭) কোন আদিবাসী গোত্রের সদস্য হলে তার নাম (Ethnic group)

(৮) লিঙ্গ (Sex) টিক চিহ্ন দিন (Put tick mark) ☐ পুরুষ ☐ নারী ☐ অন্যান্য

(৯) প্রতিবন্ধী কি না (is the victim disable?) ☐ হ্যাঁ ☐ না

হলে কী ধরণের? (if yes, type of disablement)

(১০) বয়স (Age)

(১১) ভোটার আইডি (Voter ID) নং

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ/প্রতিষ্ঠানের তথ্য (Alleged person(s)/organization(s))

(১) নাম (Name)

(২) পদবি (Designation)

(৩) পিতা/স্বামীর নাম (Father/Husband's name)

(৪) স্থায়ী ঠিকানা (Permanent address)

(৫) বর্তমান ঠিকানা (Present address)

(ঘ) মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief description about the violation of human rights)

(১) তারিখ (Date) | (২) সময় (Time)

(৩) ঘটনাস্থল (Place of occurrence)

গ্রাম/এলাকা/ওয়ার্ড :

উপজেলা :

জেলা : বিভাগ:

(৪) ঘটনার বিবরণ (Description of the occurrence)

(ঙ) বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে কোন আদালতে মামলা হয়েছে কি না (Has the said case been lodged before any court?)

☐ হ্যাঁ ☐ না

(চ) শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি না (Is this a complaint against any member of the disciplined force?)

☐ হ্যাঁ ☐ না

(ছ) যে প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়েছে (The desired remedy)

আমি ..... অভিযোগকারী এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত সকল তথ্য ও বিবরণ আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য। (I, ..., complainant, do hereby declaring that the information given in this complaint form is true to the best of my knowledge and conscience).

স্বাক্ষর / টিপসই
Signature/thumb impression

দ্র. প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে (Extra paper can be used if necessary)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ই জুলাই, ২০০৯/৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই জুলাই, ২০০৯ (৩০শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য; এবং

যেহেতু মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।- (১) এই আইন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) ইহা ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

২। **সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কমিশন" অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বপালনরত কোন ব্যক্তি;

(গ) "জনসেবক" অর্থ দণ্ডবিধির section 21 এ public servant যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক;

(ঘ) "দণ্ডবিধি" অর্থ Penal Code. 1860 (XLV of 1860);

(ঙ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) "মানবাধিকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত কোন ব্যক্তির জীবন (Life), অধিকার (Liberty), সমতা (Equality) ও মর্যাদা (Dignity) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশের প্রচলিত আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলে ঘোষিত মানবাধিকার;

(ছ) "শৃঙ্খলা-বাহিনী" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শৃঙ্খলা-বাহিনী;

(জ) "সদস্য" অর্থ কমিশনের কোন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঝ)"সাক্ষ্য আইন" অর্থ Evidence Act, 1872(I of 1872);

(ঞ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩। **জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা** ।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

৪। **কমিশনের কার্যালয়** ।- কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **কমিশন গঠন** ।-(১) চেয়ারম্যান ও অনধিক ছয়জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

(৩) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন মহিলা এবং একজন নৃতাত্ত্বিক (Ethnic) জনগোষ্ঠীর সদস্য হইতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৬। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি** ।-(১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর অপেক্ষা কম এবং ৭০ (সত্তর) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হন।

(২) আইন বা বিচার কার্য, মানবাধিকার, শিক্ষা, সমাজসেবা বা মানবকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে দুই মেয়াদের অধিক নিয়োগ লাভ করিবেন না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। **বাছাই কমিটি**। - (১) চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সাতজন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ঘ) চেয়ারম্যান, আইন কমিশন;
(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
(চ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারদলীয় এবং অন্যজন বিরোধীদলীয় হইবেন।

(২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির ফোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে এবং সিদ্ধান্তের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। **চেয়ারম্যান ও সদস্যের অপসারণ**।- (১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(খ) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

৯। সদস্যপদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া। - শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।- (১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) সার্বক্ষণিক সদস্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

১১। কমিশনের সভা।- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সার্বক্ষণিক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান এবং অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রতি দুই মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের কার্যাবলী ও তদন্তের ক্ষমতা

১২। কমিশনের কার্যাবলী ।-(১) কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(খ) কোন জনসেবক কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা বা অনুরূপ লংঘন প্রতিরোধে অবহেলা করা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ স্বতঃই বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে তদন্ত করা;

(গ) জেল বা সংশোধনাগার, হেফাজত, চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণের জন্য মানুষকে আটক রাখা হয় এমন কোন স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণের পথে বাধা স্বরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(চ) মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং উহাদের বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ছ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এর মানের সহিত কোন প্রস্তাবিত আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সহিত উহাদের সমন্বয় নিশ্চিত করিবার স্বার্থে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সংশোধন সুপারিশ করা;

(জ) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং উহাদের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(ঝ) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানে উহাদের বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করা;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে মানবাধিকার শিক্ষার প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;

(ট) মানবাধিকার বিষয়ে বে-সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং উক্তরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;

(ঠ) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘিত হইতে পারে এমন অভিযোগের উপর তদন্ত ও অনুসন্ধান করিয়া মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা;

(ড) মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

(ঢ) দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীতব্য ব্যবস্থা যাহাতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের ও নিয়মের হয় সেই লক্ষ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ণ) মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে সুশীল সমাজকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;

(ত) মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করা;

(থ) মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(দ) কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা; এবং

(ধ) মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যেকোন কার্য করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি কমিশনের কার্যাবলী বা দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথাঃ-

(ক) আদালতে বিচারাধীন মামলার কোন বিষয়;

(খ) ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন ন্যায়পাল কর্তৃক বিবেচ্য কোন বিষয়;

(গ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী এবং সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর চাকুরী সংক্রান্ত এমন কোন বিষয় যাহা Administrative Tribunals Act, 1980 (XVI of 1981) এর অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য।

১৩। সুপ্রীম কোর্ট হইতে রেফারেন্স।-(১) সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন আবেদন হইতে উদ্ভুত কোন বিষয় তদন্তক্রমে প্রতিবেদন পেশ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত বিষয়ে কমিশন তদন্ত করিয়া রেফারেন্সে উল্লিখিত সময়সীমা, যদি থাকে, এর মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

১৪। মানবাধিকার লংঘন প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা।- (১) কমিশন কর্তৃক পরিচালিত তদন্তে যদি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থিত মধ্যস্থতা ও সমঝোতা সফল না হইলে-

(ক) মানবাধিকার লংঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কোন কার্যধারা দায়ের করিবার জন্য কমিশন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে;

(খ) মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ বা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট সুপারিশ করিবে।

(৩) মানবাধিকার লংঘন করিয়াছেন বা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সংশিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া কমিশন এই ধারার অধীন কোন সুপারিশ করিবে না।

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন প্রদত্ত সুপারিশের একটি কপি কমিশন অভিযোগকারীর নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) যে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট এই ধারার অধীন সুপারিশ প্রেরণ করা হয় উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে কমিশন সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য আহবান করিতে পারিবে এবং যাচিত প্রতিবেদন দাখিল করা উক্তরূপ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে।

(৬) এই ধারার সুপারিশ প্রেরণ করা হইয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যদি প্রার্থিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হন বা প্রেরিত প্রতিবেদনে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গৃহীত প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কমিশনের মতে অপর্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে কমিশন যথাযথ বিবেচনা করিলে ঘটনাটি পূর্ণ বিবরণ রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিবে এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রতিবেদনের কপি সংসদে উত্থাপনে ব্যবস্থা করিবেন।

১৫। মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারী নিয়োগ।-(১) কোন বিষয় এই আইনের অধীন মধ্যস্থতা সমঝোতার জন্য প্রেরণ করা হইলে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পক্ষগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা সমঝোতার জন্য নিয়োগ করিবে।

(২) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে মধ্যস্থতা ও সমঝোতার জন্য মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারীর সম্মুখে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীদের অধিবেশন উন্মুক্তভাবে বা গোপনীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

(৫) মধ্যস্থতা বা সমঝোতা না হইলে বা কোন পক্ষ মধ্যস্থতা বা সমঝোতায় আপত্তি করিলে মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারী বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবেন।

(৬) যদি মধ্যস্থতা বা সমঝোতার মাধ্যমে কোন বিষয় সমঝোতা করিতে সক্ষম হয়, তা হইলে মধ্যস্থতা বা সমঝোতাকারী মীমাংসার বিষয়টি কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মীমাংসা কার্যকর করণার্থে কমিশন তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত জরিমানা প্রদানের নির্দেশসহ অন্যান্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৬। তদন্ত সম্পর্কিত ক্ষমতা।- এই আইনের অধীন অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে কমিশনের দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এর অধীন এক দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) সাক্ষীর সমন ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোন লিখিত বা মৌখিক সাক্ষ্য শপথের মাধ্যমে প্রদানের জন্য তলব করা;

(গ) বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে কমিশনের উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেওয়া বা তাহার দখলে আছে এমন কোন দলিল উপস্থাপনা করিবার জন্য তলব করা:

(ঘ) তদন্ত বা অনুসন্ধানে জনগণের অংশগ্রহণ অনুমোদন বা অননুমোদন করা।

১৭। অভিযোগের অনুসন্ধান। -(১) কমিশন, মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার বা তদ্‌ধীন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট হইতে প্রতিবেদন বা তথ্য চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে কমিশন নিজ উদ্যোগে অনুসন্ধান শুরু করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,-

(ক) বিষয়টি অধিকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই: বা

(খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার বা ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে বা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে-

তাহা হইলে কমিশন এই বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না।

১৮। শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।-(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শৃঙ্খলা বাহিনীর বা ইহার সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশন নিজ উদ্যোগে বা কোন দরখাস্তের ভিত্তিতে সরকারের নিকট হইতে প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন চাওয়া হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন,

(ক) সন্তুষ্ট হইলে, এই বিষয়ে আর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না;

(খ) প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কমিশনের নিকট হইতে কোন সুপারিশ প্রাপ্ত হইলে উক্তরূপ সুপারিশপ্রাপ্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে সরকার ইহার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে লিখিতভাবে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অভিযোগকারী বা ক্ষেত্রমত, তাহার প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করিবে।

১৯। তদন্ত পরবর্তী কার্যক্রম।-(১) এই আইনের অধীন ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও, কোন তদন্ত সমাপ্তির পর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে, কমিশন-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে এবং একই সঙ্গে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি ধরনের মামলা বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যথাযথ হইবে তাহা সুপারিশের মধ্যে উল্লেখ করিবে;

(খ) সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন আদেশ বা নির্দেশযোগ্য হইলে, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে আবেদন দাখিল করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে বা কমিশন স্বয়ং উক্ত বিভাগে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিষয়ে কমিশন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা তাহার পরিবারকে উহার বিবেচনায় যথাযথ সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করিবার জন্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধিকে সরবরাহ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন সুপারিশসহ তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি কমিশন সরকার যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত বা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে, সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিশনকে অবহিত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষের কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশের সহিত মতপার্থক্য থাকে অথবা সরকার বা উক্ত কর্তৃপক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয় বা অস্বীকার করে,

তাহা হইলে উক্ত মতপার্থক্য, অসমর্থতা বা অস্বীকারের কারণ উল্লেখ করিয়া উপরি-উক্ত সময়সীমার মধ্যে কমিশনকে অবহিত করিবে।

(৫) কমিশন সংশিষ্ট তদন্ত রিপোর্টের সারার্থ এবং উক্ত রিপোর্টের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ তদকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, গুরুত্ব বিবেচনায় কোন তদন্ত রিপোর্টের সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন উক্ত রিপোর্ট সম্পূর্ণ বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশবিশেষ প্রকাশ করিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন রিপোর্টের সারার্থ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, সেই ক্ষেত্রে উক্ত রিপোর্টের কোন কিছুই প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৬) মানবাধিকার লংঘনের দায়ে আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় বা আইনগত কার্য ধারায় পক্ষ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার কমিশনের থাকিবে।

২০। কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা।-(১) কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন।

(২) কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানকালে কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তব্যের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা রুজু করা যাইবে না উক্ত বিবৃতি বা বক্তব্য তাহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্যধারায় ব্যবহার করা যাইবে না, তবে উক্তরূপ বিবৃতি বা বক্তব্যের মধ্যে কোন মিথ্যা সাক্ষ্য থাকিলে তজ্জন্যে তিনি অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

২১। সমন প্রেরণ-(১) এই আইনের অধীন প্রত্যেক সমন চেয়ারম্যান বা সদস্য বা কমিশন কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারী করা হইবে।

(২) প্রত্যেক সমন উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট এবং যেক্ষেত্রে তাহা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে জানামতে তাহার সর্বশেষ বাসস্থানের ঠিকানায় সরবরাহ করিয়া বা রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া জারী করা হইবে।

(৩) যে ব্যক্তির নিকট সমন জারী করা হয় তিনি উহাতে উল্লিখিত সময় ও স্থানে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবেন এবং কমিশন কর্তৃক তাহাকে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং তাহার নিকট হইতে যাচিত এবং তাহার দখলে আছে এমন সকল দলিল সমনের মমার্থ অনুসারে উপস্থাপন করিবেন।

২২। কমিশনের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন।- (১) প্রতি বৎসরের ৩০ মার্চ এর মধ্যে কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদনের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে, অন্যান্যের মধ্যে, কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার কারণ, কমিশন যতদূর অবগত ততদূর, লিপিবদ্ধ থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের কর্মকর্তা, ইত্যাদি

২৩। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।-(১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে।

(২) এই আইনের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২৪) মানবাধিকার কমিশন তহবিল। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মানবাধিকার কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) মানবাধিকার কমিশন তহবিল, অতঃপর এই ধারায় তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষ, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তহবিল হইতে কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

২৫। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।- (১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোন সদস্য বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২৭। জনসেবক।- চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা দণ্ডবিধির section 21 এর public servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে public servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৮। ক্ষমতা অর্পণ।- কমিশন উহার যে কোন ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চেয়ারম্যান, সদস্য বা সচিবকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৯। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ। - এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, কমিশন, কোন সদস্য বা কমিশন বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বা সরকার বা কমিশনের কর্তৃত্বাধীন কোন প্রকাশনা, রিপোর্ট বা কার্যধারার বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

৩০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩২। হেফাজত সংক্রান্ত বিধান।-(১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ৪০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ -এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
৭/১৭, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১২৬০৪৭, ৮১২৬১৩৪, ৮১২৬১৩৭
ফ্যাক্স: ৮১২৬০৪৫
E-mail:ask@citechco.net
Web: www.askbd.org